মৃণালিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

উ ৎ স র্গ

দীনবন্ধু মিত্র

বিশিষ্ট নাট্যকার

সূচি

ভূমিকা :
বঙ্কিম : উপন্যাসের ধারায় এক ভিন্ন কণ্ঠস্বর ৯

প্রথম খণ্ড :
আচার্য ১৯; পিঞ্জরের বিহঙ্গী ২৪; ভিখারিণী ২৮; দূতী ৩৩; লুব্ধ ৩৮; হৃষীকেশ ৪১

দ্বিতীয় খণ্ড :
গৌড়েশ্বর ৪৭; কুসুমনির্মিতা ৫০; নৌকাযানে ৫৩; বাতায়নে ৫৬; বাপীকূলে ৫৮; পশুপতি ৬১; চৌরোদ্ধরণিক ৬৫; মোহিনী ৬৮; মোহিতা ৭০; ফাঁদ ৭৩; মুক্ত ৭৫; অতিথি-সৎকার ৭৭

তৃতীয় খণ্ড :
'উনি তোমার কে?' ৮১; প্রতিজ্ঞা-পর্বতো বহ্নিমান ৮৩; হেতু-ধূমাৎ ৮৫; উপনয়–বহ্নিব্যাপ্যো ধূমবান্ ৮৮; আর একটি সংবাদ ৯১; 'আমি তো উন্মাদিনী' ৯৩; গিরিজায়ার সংবাদ ৯৭; মৃণালিনীর লিপি ৯৯; অমৃতে গরল–গরলামৃত ১০৩; এত দিনের পর! ১০৭

চতুর্থ খণ্ড :
ঊর্ণনাভ ১১৩; বিনা সুতার হার ১১৫; বিহঙ্গী পিঞ্জরে ১১৭; যবনদূত–যমদূত বা ১২১; জাল ছিঁড়িল ১২৪; পিঞ্জর ভাঙ্গিল ১২৭; যবনবিপ্লব ১২৮; মৃণালিনীর সুখ কী? ১৩২; স্বপ্ন ১৩৪; প্রেম–নানা প্রকার ১৩৬; পূর্বপরিচয় ১৩৮; পরামর্শ ১৪১; মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত্ত ১৪৩; ধাতুমূর্তির বিসর্জন ১৪৫; অন্তিমকালে ১৪৮

পরিশিষ্ট ১৫১

ভূমিকা

বঙ্কিম : উপন্যাসের ধারায় এক ভিন্ন কণ্ঠস্বর

বঙ্কিমচন্দ্র তার পেশাগত জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তা তার চিন্তা ও কর্মে গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে ইতিহাসে তিনি সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে নন; বরং একজন লেখক ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চিন্তাবিদ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ছিলেন উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ঔপন্যাসিক। ঔপনিবেশিক শাসন তথা সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গদ্য ও উপন্যাসের জন্ম, তার বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক। জীবিকাসূত্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকর্তা হওয়ার ফলে পাশ্চাত্যের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রতিষ্ঠা সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পশ্চাতে চারটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমত, উনিশ শতকের শুরুতে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর আধুনিক চিন্তাধারার ফলে বাংলা গদ্যের বিকাশ; দ্বিতীয়ত সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ক্রমবিকাশ; তৃতীয়ত নব্য হিন্দুত্ববাদের উত্থান এবং চতুর্থত কলকাতায় ইংরেজি ও পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিকারী বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধারার স্রষ্টা নন; বরং প্রচলিত ধারারই ফল। তিনি পূর্বসূরিদের সৃষ্ট ধারার সুযোগ-সুবিধা পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রগতির ধারাকে আরও অগ্রসর করে একটা স্বতন্ত্র রূপ দিতে অনন্য অবদান রাখেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহিত্য জীবন শুরু করেন। তার প্রথম দিকের বাংলা ও ইংরেজি রচনা (ললিতা, মানস, Adventures of a Young Hindu Ges Rajmohan's Wife) পাঠক মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি, বরং পরবর্তীকালে পেশাগত জীবনেই তার সৃষ্টিশীল মননের বিকাশ ঘটে। মফস্বলে চাকরিরত থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন এবং বাংলার জনগণের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেন। জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংসর্গ এবং তাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া থেকে তিনি তার

উপন্যাসের চরিত্র গ্রহণ করেন। গভীরভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে তার সাহিত্য প্রতিভা শাণিত হয়েছিল এবং এর প্রভাব লক্ষ করা যায় তার উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ ও কাহিনি বর্ণনায়।

চব্বিশ পরগনা জেলার বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকা অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম দুটি বিখ্যাত উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) ও কপালকুন্ডলা (১৮৬৬) রচনা করেন। উপন্যাস দুটি দ্রুত প্রচার লাভ করে। পরবর্তীতে ১৮৮৭ সালের মধ্যে তার অন্যান্য গদ্য রচনাসহ মোট চৌদ্দটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ থেকে বঙ্কিমমনীষা রাজনীতি ও ধর্মের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ সেসময় তিনি একজন পুনরুত্থানবাদী সংস্কারক হওয়ার চেষ্টা করেন। আনন্দমঠ (১৮৮২) সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি। পরবর্তীকালে তার সব চিন্তা ধর্মীয় পূনরুত্থান ও জাতীয় নবজাগরণের কর্মকাণ্ডে আবর্তিত হয়। এ সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ ও লেখকের চেয়ে একজন দেশপ্রেমিক ও গর্বিত হিন্দু বলেই বেশি মনে হতো। তার জীবন তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও তার সৃষ্টিশীলতা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছে।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসই প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রথম তিনটি (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) ও শেষ (সীতরাম) উপন্যাস বাদ দিয়ে বাকি দশটি উপন্যাস বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। 'সীতারাম' প্রকাশিত হয় প্রচারে। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের যাত্রা শুরু। দুর্গেশন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে লিখিত। বঙ্গদর্শনের যুগের আরম্ভে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বঙ্কিমের নিজস্ব রীতি আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই সংবাদপত্রের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলো প্রকাশিত হয় বাঙালি সমাজের ভেতর মতবিনিময়ের প্রয়োজনে। দিকদর্শন, সমাচার দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, ইত্যাদি পত্রিকায় তখন নাগরিক সমষ্টিমত সংগঠনের দায়ে আরেক নতুন বাকরীতির চর্চা শুরু হয়। এই ভাষা ও সাহিত্যের ধারায় বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র উপনিবেশের ইতিহাসেরই অংশ। সাম্রাজীবাদী উপনিবেশের সমস্ত গণ্ডানি, অসম্মান ও ক্লিন্নতার ভেতর থেকে তৎকালীন সংবাদ সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যচর্চা চলতে থাকে। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম আন্দোলন এই স্বীকৃতির প্রথম চিহ্ন। তাদের তত্ত্বাবধানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলে। কলোনির মধ্যবিত্তশ্রেণি তাদের নিজস্ব আত্মদ্বন্দ্বে, শিক্ষায়, চারিত্রিক অসঙ্গতিতে খণ্ডিত জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকায় তার সাহিত্যও গড়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের আদলে। তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের এই মধ্যবিত্তের হাতেই শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তন ঘটে। বিশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান মধ্যবিত্তের অগ্রগতি শুরু হলেও তারা সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। বাংলা সাহিত্য উনিশ শতক থেকেই মূলত হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির হাতেই গড়ে ওঠে। ইংরেজ রাজশক্তি মুসলমান

সামন্ত্রতন্ত্রকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণের দিকে যে দৃষ্টি দেয়, তাতে মুসলমান সামন্ত্রতন্ত্রের কেবল আর্থিক ধ্বংসই ঘটেনি, মানবসম্পদেরও বিপর্যয় ঘটে।

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্যের প্রচলনও শুরু হয় গভর্নর জেনারেলের প্রচারিত নির্দেশে স্বদেশ থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এদেশের কর্মক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা গদ্য আকারগতভাবে অস্থির। উপন্যাসের মধ্যে যে জীবনবোধ, যুগসচেতনতা ও আদর্শের অনুসন্ধান দেখি তা 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এ (১৮৫২) পাওয়া না গেলেও 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) উপন্যাসে কিছুটা আভাস মেলে। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, সেই সাম্রাজ্যের একজন গর্বিত ও অধিকারবোধ সচেতন প্রজা হিসেবে বাঙালি তখন তার অন্য এক আত্মজীবনীর সন্ধান করে। যাতে নিজেকে আবিষ্কার করা যায় বিস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিতে। 'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা 'হুতোম পেঁচার নকশা' (১৮৬২) সেই পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিতের কথা বিন্দুমাত্র বলে না। প্রস্তুতিমূলক এই সাহিত্যকর্মটিকে পুরোপুরি উপন্যাস না বলা গেলেও নকশাজাতীয় এই রচনা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তবুও এই বহুস্বরের বিপরীতে বাঙালি অপেক্ষা করে মহৎ কোনো একস্বরের। যে স্বর লেখকের এবং কেবল লেখকেরই।

উনিশ শতকের সূচনা থেকে কলকাতা শহর একটি পরিবর্তিত চেহারা পেতে শুরু করে, কিন্তু তখনও গ্রামীণ রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মননের ফলে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি, আলালের ঘরের দুলাল-এ কলকাতার ইংরেজি স্কুল, পথঘাট-বাজার, আদালতের চিত্র যেমন আছে, তেমনি কলকাতার অদূরবর্তী বৈদ্যবাটি-বালির পল্লিজীবনের অনিবার্য পরিবর্তনের ছবিটিও তুলে ধরা হয়। বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাসের প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ এই নকশা জাতীয় রচনাটি।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই পাশ্চাত্যে উপন্যাসের ধারা পরিণত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সে যুগে ওয়াল্টার স্কট (Walter Scott, ১৭৭১-১৮৩২) ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক। তার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলো অতীতভিত্তিক রোমান্টিক কল্পনার সাক্ষ্য বহন করে। পাশ্চাত্যের উপন্যাসে স্বদেশপ্রীতি, রোমান্স ও ইতিহাসপ্রীতির প্রভাব আমাদের উপন্যাসেরও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। বিশেষত এই প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ততোদিনে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কায়েম হয়ে গেছে। কীভাবে, কোনদিক দিয়ে সমাজ ও শিক্ষার ব্যবস্থা পরিচালনা করে নিজেদের শাসন আরও

শক্তিশালী ও স্থায়ী করা যায় তা নিয়ে তখন গবেষণা চলছে। তৎকালীন কলকাতা নগর ও হিন্দু কলেজ থেকে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি সাহিত্যের এই ভাবধারা গ্রহণ করে।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যে এই প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলা সাহিত্য এর ব্যতিক্রম নয়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার সমাজ সংস্কারমূলক নানা ঘটনা ঘটে যেমন বিধবা বিবাহ প্রচলন, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, নারী শিক্ষার প্রচলন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব। এসব নানাবিধ সামাজিক অনুষঙ্গের সঙ্গে রাজনৈতিক নানা ঘটনাও সাহিত্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একইসঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সাহিত্য জ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটে আমাদের সাহিত্যে।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী ইত্যাদি উপন্যাস এ যুগেরই সৃষ্টি। দুর্গেশনন্দিনী লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে স্কটের The Antiquary উপন্যাসের প্রভাব ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেই প্রথম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রেমের পরিচয় মেলে। যে সমাজে নারীরা একেবারেই পশ্চাৎপদ সেখানে কপালকুণ্ডলা, দেবী চৌধুরানীর মতো চরিত্র সৃষ্টি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু তা বাংলা সাহিত্যে এক হঠাৎ পরিবর্তন। ফলে বঙ্কিমের মধ্যেও কাজ করে এক ধরনের স্ববিরোধিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস একদিকে রোমান্স ও অন্যদিকে ইতিহাসাশ্রয়ী।

একারণে আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসে পাশ্চাত্যের আদলে গড়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের নবরূপায়ণ দেখি। বঙ্কিম তার আখ্যানকে নিয়ে যান ৯৯৭ বঙ্গাব্দে (দুর্গেশনন্দিনী), আকবরের শাসনামলে (কপালকুণ্ডলা), লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় (মৃণালিনী)। ফলে তার উপন্যাস নব্যশিক্ষিত পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের এই সূচনা হলো জনসাধারণের জীবন থেকে বহুদূর গিয়ে। সাধারণ বাঙালি জীবনের অনুষঙ্গ সেখানে উপস্থাপিত হয়নি। ইংরেজ ভদ্রসমাজের বা অভিজাত শ্রেণির অনুকরণ করতে গিয়ে এবং এদেশীয় অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা তাই অনেকটাই বিসদৃশ হয়ে পড়ে।

বঙ্কিমের আগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের কোনো উদাহরণ না থাকায় তার সামনে ইউরোপীয় উপন্যাসের মডেলটিই ছিল একমাত্র উদাহরণ। ফলে এরকমভাবে উপন্যাস লিখলেই উপন্যাস হয়ে উঠবে এ বিষয়ে তিনি অনেকটাই স্থিতসিদ্ধান্তে পৌঁছান। তিনি বাঙালি জীবনের অন্তর্নিহিত নাটকীয় গুণকে ব্যবহার করেন। যেখানে জনসাধারণের অনুপ্রবেশ নেই বললেই চলে। তবে উপন্যাসের সূচনাপর্বে বঙ্কিমের ভিন্ন প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য ভূমিকা রাখে। ১৮৬৫-র বছর দশেক আগে বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় আর তখন বাংলা উপন্যাসের নায়িকা ঘোষণা করে, 'এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'